পিনবল

এম জে বাবু

অরণ্যমন প্রকাশনী

লেখকের কথা

গল্পটা বিদেশি প্রেক্ষাপটে, ইংল্যান্ডের কাল্পনিক এক উপশহরের। বইটা বাংলাদেশ থেকে বের হওয়ার পর প্রচণ্ড সাড়া ফেলে। মাত্র কয়েকমাসে প্রথম এডিশন যখন শেষ হয় তখন চোয়াল ঝুলে পড়ে আমার ও প্রকাশকের। দু'জনের কেউই ভাবতে পারিনি, বিদেশি প্রেক্ষাপটে লেখা একটা গল্প পাঠকদের কাছে এভাবে সমাদৃত হবে।

প্রতিটা বই বের হওয়ার আগে আমি প্রচণ্ড ভয়ে থাকি। ভাবি পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করার কথা। পরপর দুটো বই জনপ্রিয় হওয়ার পর পাঠকদের প্রত্যাশা বাড়বেই। তৃতীয় বই ছিল 'পিনবল'। এই বইটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বই বিপণন সংস্থার বেস্টসেলিং লিস্টে জায়গা করে নেয়। বইটার জনপ্রিয়তা এখনও কমেনি। আশা করি ওপার বাংলার পাঠকদেরও বইটা ভালো লাগবে। আর আপনাদের ভালো লাগাটাই আমার সফলতা।

এম. জে. বাবু
ঢাকা, বাংলাদেশ
৬-৯-২০২২
authormjbabu@gmail.com

মঙ্গলবার

১

প্রতিটা ট্র্যাজেডি গল্পের শেষটা বেশ খারাপ হলেও, শুরুটা কিন্তু বেশ রোমান্টিক আর সুখের হয়। এই ধরুন, রোমিও-জুলিয়েটের কথা। দু'জনের শুরুটা ছিল বেশ দুর্দান্ত, ভালোবাসায় রঙিন ছিল তখন তাদের জগত। দু'জনে ভেবেছিল তাদের সুখের রাজ্যের কথা, রঙিন এক ভবিষ্যতের কথা, যেখানে দুঃখ এসে বারবার ফিরে যাবে তাদের দরজা থেকে। ভালোবাসার দরজা আটকে দেবে সমস্ত দুঃখ। কিন্তু হয়েছে কি এমন? না, হয়নি। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে তাদের স্বপ্ন কঠিন বাস্তবতায় পরিণত হল। বাস্তবতার বেড়াজাল আঘাত করতে লাগল বেশ কঠিন করে। রোমান্টিক কাহিনি পরিণত হল নিরেট ট্র্যাজেডিতে।

আবার কোনো কোনো কাহিনি কিন্তু প্রথম থেকেই ট্র্যাজেডি। সফোক্লিসের ইডিপাসের কাহিনি জানেন তো? আচ্ছা, বলছি আমি। কেন বলছি, তা বরং গল্পটা শেষ করেই বলি।

ইডিপাস নাটকে দেখা যায়, থিবস নগরের শাসক রাজা ইডিপাস দেবতাদের অভিশাপে পিতার হত্যাকারী ও মায়ের শয্যাসঙ্গী হন, নিজের অনিচ্ছায়, একটুও ধারণা ছিল না তাঁর এ-ব্যাপারে। দেবতারা কিন্তু ইডিপাসকে অভিশাপ দেননি। দিয়েছেন তাঁর পিতা রাজা লাস-কে। ওরাকল ভবিষ্যৎবাণী করেন, নিজের ছেলের কাছে রাজ্যচ্যুত হবেন লাস, পাশাপাশি মারাও পড়বেন নিজের ছেলের হাতে। রাজা লাস দেবতাদের এই অভিশপ্ত নিয়তি এড়ানোর জন্য ইডিপাসকে হত্যার উদ্যোগ নেন। এক মেষপালকের ওপর এই কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেন।

নিয়তির বিচার কে আর এড়াবে! এক মেষপালক ইডিপাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে সিথায়ন পর্বতে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু হত্যা করতে পারে না। পারবে কী করে? রাজা বা সম্রাটের মতো তার ছিল না কঠিন হৃদয়, যে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য খুন করবে নবজাতক সাম্রাজ্যের উত্তরসূরিকে। সে ছিল সাধারণ একজন মানুষ, নবজাতক খুন করার মতো পিশাচ তার ভেতরে বাস করেনি কোনোদিন। ছেলেটিকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু নিজের কাছে তাকে রাখতেও পারবে না সে। তাই শাপগ্রস্ত শিশুটিকে মেষপালক তুলে দেয় কোরিন্থ নগরের নিঃসন্তান রাজা পলিবাসের হাতে।

রাজা পলিবাস ও রানি মেরোপির সন্তান হিসেবে বড়ো হয়ে ইডিপাস জানতে পারেন তাঁর আসল বাবা-মায়ের কথা। ভবিষ্যৎবাণীটাও আর

অজানা রইল না, তিনি হবে পিতৃহন্তারক, নিজের মায়ের শয্যাসঙ্গী। এই দৈব এড়াতে কোরিন্থ ত্যাগ করে থিবসে আসেন যুবক ইডিপাস এবং সেখানে তাঁর হাতে খুন হন থিবসের রাজা লাস। ইডিপাস তখনও জানতেন না যে তিনি হত্যা করেছেন নিজের বাবাকে। এদিকে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো থিবসে। শোকমগ্ন রাজ্যের সাময়িক দায়িত্ব নেয় লাসের শ্যালক ক্রেয়ন।

অবশ্য ঘটনা সেখানেই শেষ না। নিজের পিতাকে হত্যা করেই ইডিপাস পা বাড়ান থিবসের দিকে। থিবস নগরীর তোরণদ্বারের বাইরে একটি স্ফিংসের দেখা পেলেন ইডিপাস। স্ফিংসটি দেখতে বেশ অদ্ভুত! তার শরীরটা অর্ধেক নারী অর্ধেক সিংহর মতন, আবার পিঠে পাখির মতো ডানাও আছে। এই রাক্ষসটি সর্বক্ষণ থিবসবাসীদের আতঙ্কিত করে রেখেছিল। স্ফিংসের জ্বালায় থিবসবাসী অতিষ্ঠ। কেউ মারতে পারছে না এই জানোয়ারটাকে। বাধ্য হয়ে ক্রেয়ন ঘোষণা করে, যে স্ফিংসকে হত্যা করবে সে-ই হবে থিবসের পরবর্তী রাজা। লাসের স্ত্রী'র নাম কিন্তু জোকাস্টা, আগে বলিনি। ওই যে, আমি গল্পকার হিসেবে একেবারেই ভালো নই, তাই সিকোয়েন্স অনুযায়ী গল্প বলতে পারি না। তবে আমি কিন্তু সামারি বলছি, পুরো গল্প নয়। পুরোটা জানতে হলে পড়ে নিন পুরো গল্পটা।

সেই স্ফিংসের ছিল অদ্ভুত শখ। সে রাজ্যের সদর দরজায় বসে থাকত। যে তার সামনে যেত, তাকে জিজ্ঞেস করত একটা ধাঁধা। উত্তর দিতে না পারলে খেয়ে ফেলত। এদিকে রাজ্যে বাইরের বণিক বা রাজদূতরাও প্রবেশ করতে পারে না, বেশ ঝামেলা। বুঝতেই তো পারছেন। যাক, ধাঁধাটিও বেশ ইন্টারেস্টিং।

ধাঁধাটি হল, 'একটি মাত্র কণ্ঠস্বর সকালে চার পায়ে হাঁটে আর দুপুরে দু'পায়ে আর তিন রাতে। কী?'

আপনি যদি স্মার্ট হন তাহলে কিন্তু জেনে গেছেন কী। ইডিপাসও ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান। ইডিপাস জবাব দিল, "মানুষ। নবজাতক চার পায়ে হামাগুড়ি দেয়, বড়ো হয়ে দুই পায়ে হাঁটে, আর বৃদ্ধ হলে লাঠি ব্যবহার করে।"

ধাঁধার উত্তর পেয়ে স্ফিংস আত্মহত্যা করে। আমিও চেষ্টা করেছিলাম এই জানোয়ার কেন এমন করল তা জানতে, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। আপনারা পেলে জানাবেন আমাকে। আমাকে গল্পটা শেষ করতে দিন আগে। তারপর ধীরে ধীরে সব কাহিনি আপনাদের বলব। একটু ধৈর্য ধরুন।

ক্রেয়নের ঘোষণা অনুযায়ী ইডিপাস থিবসের রাজা হলেন। সবাই

ভাবল লাসকে হত্যা করেছে স্ফিংস। বিয়ে হল নিজের মা জোকাস্টার সাথে। যে ভবিষ্যৎবাণী এড়ানোর জন্য লাস নিজের সন্তানকে হত্যা করতে পাঠান, সন্তান যাতে বাবাকে হত্যা না করে সেজন্য উদ্বাস্তু হয়, সেই ভবিষ্যৎবাণী কি তিনি এড়াতে পেরেছিলেন শেষপর্যন্ত? না, পারেননি। নিয়তি অমোঘ জিনিস, যেটা কেউ বদলাতে চাইলেও, সেই বদলানোটা নিয়তির রেখাকে আরও মজবুত করে দেয়। মানুষ অসহায়, বড্ড অসহায়। সাধারণ মানুষের সাথে মানুষ জিততে পারে না, নিয়তির সাথে কী করে জিতবে? খুব ট্র্যাজিক, না?

আমার জীবনটাও তেমন। কালো ছায়া কখনও মাথার ওপর থেকে কাটেনি। পুরো জীবনটা কাটিয়েছি কষ্টে। যা একটু আলো ছিল, সেটাও পরিণত হওয়ার আগেই নিভে গেছে। অন্ধকার হয়ে যায় আমার জীবন আবার। উইন্ডেনে যেটা হয়েছে সেটা প্রথম থেকেই ট্র্যাজিক ছিল, যা আমি বা আমার কলিগরা কেউই বুঝতে পারিনি। একবিংশ শতাব্দীর শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যে। চারিদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, মানুষ মঙ্গলে যাওয়ার চিন্তা করছে; সেখানে এরকম কিছুর মুখোমুখি হওয়াটা যেমন অস্বাভাবিক, তেমন অবিশ্বাস্য।

আমিও তো ছিলাম গোঁড়া নাস্তিক। বাকিদের মতো সমস্ত ঘটনাকে দেখেছিলাম বেশ স্বাভাবিক চোখে। বোঝার মতো অবস্থা যখন হয় তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। বুঝতে পারলে হয়তো আমি এড়িয়ে যেতে পারতাম। সেই দুঃখের অমোঘ ছোঁয়া আমার সাথে লেগে থাকবে আমৃত্যু, তা এড়াতে পারব না নিশ্চয়ই। আমি গল্পকার নই, যে বানিয়ে গল্প বলব, উপমা মিশিয়ে তৈরি করব এক জাদুর দুনিয়া। সাধারণ একজন পুলিশ অফিসার, যার দুনিয়াটা কেবল কাজ আর মদের মধ্যে বন্দি। দুই মাস আগে ঘটে যাওয়া সবকিছু মুখরোচকভাবে বলতে পারব না ঠিকই, কিন্তু চেষ্টা করব গুছিয়ে বলার। তাহলে শুরু করি আমার শোকগাথা।

আমি এমন লোক নই যে নিয়মিত তারিখে চোখ রাখে, সময় দেখে যন্ত্রের মতো দিন পার করে; যার দিন শুরু অ্যালার্ম ঘড়ির খট্ খট্ শব্দ শুনে; আর সমাপ্তি ঘটে বউয়ের কপালে চুমো খেয়ে কিংবা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এরকম নিয়ম-মানা আদর্শ ছেলে আমি কোনোকালেই ছিলাম না, যার ফলে চল্লিশের গোড়ায় এসেও আমাকে নিজের জীবনটাকে ছোটো একটা জগতে গুটিয়ে নিয়ে পার করতে হচ্ছে। একাকীত্ব আমাকে তার বাগদত্তা বানিয়ে ফেলেছে, তাই সে ছাড়া জীবনে অন্য কেউ এলে তাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে আমার।

তবে একাকীত্বই যে আমার সবকিছু, তা কিন্তু না, মাঝেমধ্যে মদের

নেশায় ডুবে গিয়ে মদকে সঙ্গী করার চেষ্টা করি। কোনো কোনো দিন সফল হই, আবার কোনো কোনো দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাই অতীতে। অবগাহন করি দুঃখের হ্রদে। তবে মদের হ্রদ, যেটা আমার দুঃখ ভোলার আশ্রয়স্থল, সেটার নাম 'দ্য কিঙ্কি গার্ল'। আমার প্রিয় পানশালা, যার নাম দেখে অনেকে মনে করে এটা একটা স্ট্রিপ-ক্লাব, কিন্তু এটা মোটেও সেরকম নয়; আমার মতো লুজারদের জন্য সেটা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের মতো কাজ করে। তবে সেখানে সারা দুনিয়ার লুজাররা এক না হলেও উইন্ডেনের লুজাররা এক হয়। যদিও এটার নাম দেখে মোটেও বোঝা যায় না যে এটা একটা লুজার ক্লাব। জাঁকজমকপূর্ণ একটা নিয়নের বিলবোর্ড, ভেতরে থেকে আসা জ্যাজ মিউজিকের শব্দ, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পতিতারা— সবকিছুই ইঙ্গিত করে কোনো স্ট্রিপ-ক্লাবের দিকে।

দিনের সমাপ্তি পরিপূর্ণ করতে দ্য কিঙ্কি গার্ল পাবে মদ গিলতে যাই; মদ গিলে বারের বেঞ্চেই মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বেহুঁশ থাকতে হয়; তারপর টলতে টলতে মাতাল হয়ে বাসায় কিংবা বারের গোলটেবিল অথবা গাড়ির রুক্ষ সিটে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে হয় আমাকে। মাঝেমধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকি রাস্তায়, কিংবা পার্কের বেঞ্চে। মাঝেমধ্যে মাথা ঠেকানোর আশ্রয় হিসেবে কাজ করে স্ট্রিট লাইটের শক্ত খুঁটি। শীত আসার পর আমি সতর্ক হয়ে যাই বেশ। চেষ্টা করি মাতাল না হতে। তবে বাড়ি ফিরে আসার মতো সব সময় অবস্থা থাকে না আমার। একজন মদ্যপ হিসেবে বেশ সুনাম কুড়িয়েছি এই কয়েক বছরে।

সেদিন আমি বেশি মদ গিলিনি। মন ভালো ছিল বেশ। মন ভালো থাকলে নিজেকে আর বিকিয়ে দিই না মদের কাছে। মাসে একবার যাই নিজের পছন্দের রেস্তোরাঁয়, 'টুইটি বার্ডস'-এ। পেট ভরে খাই, সময় কাটাই, বই পড়ি। রেস্তোরাঁর দোতলায় আবার বিশাল লাইব্রেরি। ওখান থেকে বই নিয়ে রেস্তোরাঁর মনোরম পরিবেশে বই পড়তে মন্দ লাগে না। দুপুরের অবকাশ ছেড়ে সন্ধ্যায় থানায় যাই। রেজিস্ট্রি খাতায় নাম তুলে আবার চলে আসি কিঙ্কি গার্লে।

ইচ্ছে ছিল বিয়ার ছাড়া কিছু নেব না। কিন্তু রাত বাড়ার সাথে কেবল অন্ধকারই বাড়ে না। বাড়ে মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা কষ্ট। যা সামাল দিতেই কয়েক পেগ ব্লু জিঞ্জার, আর মস্কো মুল খেয়ে মাতাল হওয়ার ভাব নিয়ে টেবিলে মাথা রেখে পড়ে ছিলাম। চোখে জ্বালাপোড়া আর বরাবরের মতো মনে একটা বিষাদ। চারপাশের গুঞ্জনের মধ্যেও আমার কানগুলো যেন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে প্রায়। সেদিন রাতে স্টেক খেয়েছিলাম। বারে মদের সাথে কিছু খাবার পাওয়া যায়। তার মধ্যে স্টেকটা অন্যতম।

মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন খেলে গেল, "আচ্ছা, তোমরা কি দরজাটা তালাবন্ধ পেয়েছিলে?"

হ্যামলেট আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তার দৃষ্টি অনেক দূরে হারিয়ে গেছে। অসাড় এক ভঙ্গি করে আমাকে বলল, "একটা তালা ঝুলছিল তবে সেটা একদম নতুন লাগানো। এক প্রতিবেশী নিশ্চিত করল যে এই তালাটা আশার লাগিয়ে যায়নি।"

"তাহলে এই ছ'জন মানুষকে যদি মেরে এখানে আনা হয় তাহলে কারও না কারও চোখে পড়ার কথা। ছ'জনকে তো একদম হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে আসেনি। বয়ে আনতে হয়েছে।"

"আমি পুরো লজে তল্লাশি চালিয়েছি। সেরকম কিছুই নজরে পড়েনি আমার।"

"কোনো দাগ, চুল, দড়ি?" ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম।

"না, পাইনি। দিনে আর একবার ভালো করে দেখব। এই কেসে অনেক পাজল। প্রথম পাজল হল, এরকম নৃশংস কাজ করল কে? আশার, না অন্য কেউ? আশার হলে তালা বদলাবে কেন আর সবথেকে বড়ো প্রশ্ন হল, এরকম দানবীয় ক্যানভাস প্রদর্শন করার মানে কী?", বেশ উত্তেজিত গলায় বলল হ্যামলেট। দু'জনের মাথায় প্রচুর প্রশ্ন। উত্তর পাব না জানি, তবুও আমরা ক্রাইম সিনে নিজেদের জিজ্ঞাসাগুলো শেয়ার করি। সামনে কাজ করার নকশা হিসেবে বেশ কাজে দেয় এই প্রশ্নগুলো।

"খুনি আশার না। সে খুন করে অ্যাট লিস্ট নিজের ঘরে এরকম করত না। আর এখানে একজন থেকে কয়েকজন খুনি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।"

"আমিও এটা ভাবছি। আশার হলে তার পুরোনো তালা লাগিয়ে যেত। তবে সবথেকে অদ্ভুত হল আশার যেদিন চলে যায়, সেদিন পাশের ঘরের জেনি হেডলি তার ঘরে আসে। তখন তার ঘরে সব ছিল, মানে আসবাবপত্র ইত্যাদি। তুমি খেয়াল করেছ? সেখানে কিন্তু কিছু নেই।"

আমি ভেবেছিলাম মালিক বুঝি সবকিছু বিক্রি করে নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু হ্যামলেটের মুখে সেই কথা শোনার পর মাথার মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন খেলে গেল। আর সেই প্রশ্নগুলো এমন রাস্তার দিকে নিয়ে গেল যেগুলো স্রেফ অন্ধকারের চোরাবালিতে হারিয়ে যায়, কোনো জবাব মেলে না।

আমি নব ঠেলে বললাম, "ফরেনসিকের জন্য সকাল পর্যন্ত বসে থাকলে হবে না। তুমি বাইরে থাকো, আমি একটু ভেতরে গিয়ে দেখছি।"

হ্যামলেট পকেট থেকে ডান হাত বের করে আমাকে বাধা দিয়ে বলল, "দয়া করে নিজের ছেলেমানুষি বন্ধ করো। ফরেনসিক আসার আগে আমাদের ক্রাইম সিনে ঢোকার অনুমতি নেই।"

আমি জবাব না দিয়ে জোর করেই ভেতরে ঢুকে গেলাম। সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম রক্তের ছাপ আর মাংসের টুকরোগুলো এড়িয়ে যেতে। ফ্লোর থেকে ভেসে আসছিল এক বিচ্ছিরি গন্ধ। আমি রুমালটা দিয়ে নাক চেপে ধরলাম। ফ্লোরে রক্তের ছাপ ছাড়া কিছুই নেই। এমনকি এখানে যে একসময় কোনো আসবাব ছিল, সে প্রমাণও নেই।

দরজা থেকে বামপাশের দেয়ালে চোখ পড়েনি। কারণ এদিকের দেয়ালটা ভেতরের দিকে চলে গেছে। কামরার মাঝখানে আসতেই চোখে পড়ল সেদিকের ঘরটা। এটা সিঙ্গল রুম, তাই ওটা বাথরুম হবে নিশ্চয়ই। আমি সবকিছু এড়িয়ে মাথাগুলোর কাছে চলে গেলাম।

দেয়ালের মাংসগুলো আমার মুখ বরাবর, সেখান থেকে মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে। মানুষের মাংসের গন্ধ যে এত জঘন্য সেটা আমি কখনও ভাবিনি। দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। তবুও আমি থেমে থাকলাম না। সবকিছু ভালো করে দেখতে লাগলাম এই আশায়, যদি কিছু হাতে লাগে। আধ ফুট পিছিয়ে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালাম। ছ'টা মাথা আমার দিক করে ওপরে লাইন ধরে লাগানো। মানুষ শিকার করতে ভালোবাসে। হরিণ, ভাল্লুক কিংবা অন্য বন্যপ্রাণী শিকার করে তাদের মাথা দেয়ালে ঝোলানো হয় লোককে দেখানোর জন্য। এই মাথাগুলোকেও ঠিক একইভাবে দেয়ালে লাগানো। মনে হচ্ছে কেউ তার শিকার করার নৈপুণ্য দেখাতে চাইছে, জাহির করতে চাইছে বীরত্ব।

"উইল, তুমি এভিডেন্স নষ্ট করছ," দরজায় দাঁড়িয়ে হুংকার দিল হ্যামলেট।

আমি পেছন ফিরে না তাকিয়ে মাথাগুলোকে দেখতে লাগলাম। চোখের পাতাগুলো এমনভাবে কাটা হয়েছে যাতে স্পষ্ট দেখা যায় চোখের কোটরটা। আততায়ীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। চোখের কোটরের সম্পূর্ণটা একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোটর ছাড়া কপাল কিংবা গালের কোনো অংশে কাটার দাগ নেই। লাশগুলোর সামনে থাকার ফলে আমার ভেতরটা গুলিয়ে উঠছিল, বমি আসছিল আবার।

এখানে বমি করলে আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে, এমনিতেই কাল আমাকে অনেক জবাবদিহি করতে হবে। আমি ওইদিকের ঘরটার দিকে ছুটলাম বমি করার জন্য। ঘরের কাছে এসেই দেখি ভেতরে বাতি জ্বলছে। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো বোঝা যাচ্ছে। ঘরের বাইরে সুইচ চেপে দরজার নব ধরে মোচড় দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ধপাস করে শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা।

ফ্লোরের দিকে তাকাতেই সামনে না গিয়ে উলটে পেছনে চলে এলাম।

ভেতরে আর একটা লাশ পড়ে আছে, একদম উলঙ্গ। তবে এটা তেমন বিক্ষিপ্ত না; একদম আস্ত, তবে তার মুখের চামড়া তোলা। দেখেই আমি চিৎকার করে হ্যামলেটকে ডাক দিলাম। চিৎকার শোনার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হ্যামলেট সেখানে হাজির।

লাশটার দিকে সে-ও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমরা দু'জন পাথর হয়ে গেলাম কয়েক মিনিটের জন্য। পেছন থেকে হঠাৎ করে একজোড়া পায়ের শব্দ শুনতেই বিমূঢ় অবস্থাটা কাটল দু'জনের। হ্যামলেট লাশের দিকে তাকিয়ে রইল, আর আমি পেছনে ফিরে দেখলাম দরজার নব ধরে নিউট মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে মাথাগুলোর দিকে।

কয়েক সেকেন্ড পর সে-ও পেছনে সরে গেল। আমি তার বমি করার শব্দ পেলাম। হ্যামলেট আমাকে কিছু না বলে ঘরটার ভেতরে চলে গেল। লাশটার মাথা কমোডের দিকে, আর পাগুলো দরজার দিকে। একটা পুরুষের লাশ। সে খানিকটা চিত হয়ে আছে। একটা হাত পেটের ওপর পড়ে আছে, অন্য হাত দেয়ালের গায়ে লেগে আছে। মুখটা সোজা দরজার দিকে ফেরানো। এতক্ষণ দেখিনি, তবে এখন সেদিকে খেয়াল করে দেখলাম যে এক অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা। একটা চতুর্ভুজ, সেটার ভেতর আবার একটা বৃত্ত, বৃত্তের মধ্যে একটা উলটো ক্রুশ।

হ্যামলেট সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কী?"

আমি জবাব দিলাম না। পেছন থেকে নিউটের গলার শব্দ শুনলাম। সে বলল, "কষ্ট করে বের হও এখন।"

নিউটের এত দ্রুত উপস্থিতি দেখে আমি আর হ্যামলেট দু'জনেই অবাক হলাম। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলাম দু'জনে। নীরব দৃষ্টি বিনিময়ে প্রশ্ন কাজ করছিল, 'নিউট এত তাড়াতাড়ি এল কী করে?'

"কী হল? লিখিত নোটিশ পাঠাতে হবে?" নিউট ঠাট্টার সুরে বলল।

নিউটের ডাক শুনে আমি বের হলাম, হ্যামলেটও বের হল আমার পেছন পেছন। সেখান থেকে বের হতেই যেন বাতাসটা আবার হালকা হয়ে গেল। বুক ভরে শ্বাস নিলাম দু'জনে। এখানে থেকে আর লাভ হবে না, নিউট তার কাজ করুক। আমাদের নিচে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সে কাজ সেরে বের হচ্ছে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা যাবে ক্রাইম সিন নিয়ে।

আমি হ্যামলেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, "চলো নিচে গিয়ে তামাক পোড়াই।"

হ্যামলেট নাক টেনে হাঁটা শুরু করল। আমি কামরাটার দিকে আর একবার তাকিয়ে হ্যামলেটের পিছু নিলাম সেদিন। লিফটের কাছে আসতেই

হ্যামলেট বলল, "বাথরুমে কি আশার পড়ে আছে?"

আমি জবাব দিলাম না। বাথরুমে কে আছে সেটা চিহ্নিত করার উপায় নেই। যে পড়ে আছে তার চেহারার চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে, শরীরে একটা কাপড় নেই যে সেটা দেখে চিহ্নিত করা যাবে, তবে আমি তার পায়ের কাছে একটা কাটা দাগ লক্ষ করেছি, সেটা দেখে আপাতত কিছু করা যাবে কি না সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিচে চলে এলাম আমরা।

নিচে এসে দেখি দু'জন পুলিশ কয়েকজন মানুষের সাথে তর্ক করছে। বেশ জোরে জোরে কথা বলছে তারা। তাদের দেখে আশপাশের সিভিলিয়ান জড়ো হচ্ছে। আমরা যেতেই তাদের একজন আমাদের বলল, "স্যার, এঁরা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে চান।"

আমি সবার দিকে একবার চোখ বোলালাম। তিনজন পুরুষ, দু'জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে দু'জনের বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, একজন হিসপানিক আর একজন সম্ভবত আইরিশ। বাকি একজনের বয়স একুশ হবে, ছিমছাম দেহ আর মুখে অসংখ্য ব্রণের দাগ। দু'জন মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে তারা খুব ভয়ে আছে। যদিও পুরুষদের মধ্যে তেমন কোনো ছাপ দেখিনি আমি। দু'জন মহিলার একজনের বয়স আটাশ থেকে বত্রিশ হবে, বাদামি চুল, লম্বা মুখ, মুখে ভারী মেকআপের ছাপ। আর একটি মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে পাংক গোষ্ঠীর কেউ। বয়স বেশি হলে পঁচিশ হবে। টি-শার্ট আর শর্টস পরে আছে। গলায় ব্রেস। নোজ রিংটা নাকের চেয়েও বড়ো।

"আপনারা সবাই তিন তলার?" আমার পেছন থেকে হ্যামলেট জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ," আইরিশ পুরুষটি জবাব দিল।

আমি সবাইকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলাম, "আপনারা কেউ কিছু টের পাননি?"

সবাই মাথা নেড়ে না-বোধক জবাব দিল। কেউ একটু কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করল না। সবার গলা হয়তো শঙ্কায় আটকে গেছে। আমি এবার পাংক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আশারকে কতদিন ধরে চিনতে?"

"দুই মাস," মেয়েটি চট করে জবাব দিল।

"সে মানুষ হিসেবে কেমন ছিল?"

"আমি তো আর ওর ঘরে গিয়ে বসে থাকি না যে জানব সে কেমন। তবে লিফট কিংবা অন্য জায়গায় দেখা হলে হাই-হ্যালোতেই আমাদের কথা সীমাবদ্ধ থাকত।"